

দুধ উৎপাদনে ভারতের উত্থান এবং বাংলাদেশের অভিযাত্রা (প্রথম পর্ব)

ড. মো. গোলাম রব্বানী

প্রধান কারিগরি সমন্বয়ক প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকাশ: ১১:০০ এএম, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২২



ক) পার্শ্ববর্তী দেশের উদাহরণঃ

১। ডক্টর ভার্গিস কুরিয়েন

ডক্টর ভার্গিস কুরিয়েন কেরালার ক্যালিকট, বর্তমানে কোজিকোড-এর একটি সমৃদ্ধ সিরিয়ান খ্রিস্টান পরিবারে ১৯২২ সালের ২রা নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার বাবা পুতেনপাড়কল কুরিয়েন ছিলেন ব্রিটিশ কোচিনের সিভিল সার্জন এবং তার মা একজন উচ্চ শিক্ষিত মহিলা ছিলেন। জনাব কুরিয়েন মাদ্রাজের লয়োলা কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় বিএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি সরকারি বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে এবং সেখানে তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিস্টিংশনসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। পড়াশোনা শেষে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং ১৯৪৯ সালের ১৩ই মে তিনি গুজরাটের কয়রা জেলার আনন্দ অঞ্চলে চলে যান। তিনি সেখানে দেখতে পেলেন যে, 'পেস্টনজি এডুলজি' নামে পরিচিত চতুর ব্যবসায়ীদের দ্বারা দুধ উৎপাদনকারী কৃষকরা শোষিত হচ্ছে। এই 'পেস্টনজি এডুলজি' নামক প্রতিষ্ঠানটি পোলসন মাখন বাজারজাত

করছিলেন সে সময়। কৃষকদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে তাদের নেতা ত্রিভূবনদাস প্যাটেল সেসময় কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে শোষণের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন। এই ত্রিভূবনদাস প্যাটেলের ব্যক্তিত্ব দ্বারা ড. কুরিয়েন বিমোহিত হলেন এবং সরকারি চাকুরী ছেড়ে প্যাটেলের সাথে যোগ দিলেন। তারা যৌথভাবে কয়রা জেলা সমবায় দুগ্ধ উৎপাদনকারী ইউনিয়ন লিমিটেড (কেডিসিএমপিইউএল) নামে সমবায় নিবন্ধন নিয়ে ডেইরী খামারীদের ভাগ্যোন্নয়নে আন্দোলন শুরু করলেন, যা পরবর্তীকালে বর্তমানে জনপ্রিয় ‘আমূল’ নামে পরিচিতি পায়।

ড. কুরিয়েন ১৯৫৩ সালে ১৫ই জুন সুসান মলি পিটারকে বিয়ে করেছিলেন। ড. কুরিয়েন এমন একজন মানুষ যিনি দুধের ঘাটতি দেশ ভারতকে বিশ্বে বৃহত্তম দুধ উৎপাদনকারী দেশে পরিণত করেছিলেন। তার অনুপ্রেরণামূলক নেতৃত্বে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যেমনঃ গুজরাট সমবায় মিল্ক বিপণন ফেডারেশন লিমিটেড (জিসিএমএমএফ) এবং জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড (এনডিডিবি) গড়ে উঠেছিল, যা সারা ভারতে দুগ্ধ সমবায় আন্দোলন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে।

ড. কুরিয়েন সর্বদা নিজেকে কৃষকদের কর্মী হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং ৫০ বছরেরও বেশী সময় ধরে তার কর্মের জন্য তিনি ১৫টি সম্মানসূচক ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন। তার ব্যক্তিত্ব, চেতনা, অবিচ্ছিন্ন ক্যারিশমা এবং অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার বিশ্বাস তাকে বহু নেতৃত্বের সম্মান দিয়েছিল। তিনি কমিউনিটি নেতৃত্বের জন্য রামন ম্যাগসেসে পুরস্কার-১৯৬৩, পদ্মশ্রী-১৯৬৫, পদ্মভূষণ-১৯৬৬, কৃষকরত্ন পুরস্কার-১৯৮৬, বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার-১৯৮৯, পদ্ম বিভূষণ-১৯৯৯, কর্পোরেট এক্সিলেন্সের জন্য ইকোনমিক টাইম পুরস্কার-২০০১, ইত্যাদি অর্জন করেছিলেন। তবে দেশের মানুষ তাকে সেরা পুরস্কার দিয়েছিল ‘ভারতের মিল্কম্যান’ খেতাব দিয়ে। ২০১২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে এই মহান শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ড. কুরিয়েন সেই ব্যক্তি হিসেবে স্বরণে থাকবেন যিনি দুধের অর্থকে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে পূর্ণঃসংজ্ঞায়িত করেছিলেন।

২। আমূলের সূচনা:

ভারতের আহমেদাবাদ থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে আনন্দ নামে একটি ছোট্ট শহর রয়েছে। আমূল ভারতের একটি বিখ্যাত ডেইরী ব্রান্ড। গুজরাটের পোলসন ডেইরী যা ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এই প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের কাছে মানসম্মত দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহ করেছিল সে সময়। যেসব খামারী পোলসন ডেইরীর নিকট দুধ বিক্রি করত, তাদের অন্য কারও নিকট দুধ বিক্রির অনুমতি ছিল না। এভাবে দুগ্ধ খামারীগণ শোষিত হচ্ছিলেন। ভারতের জাতীয় নেতা সরদার ত্রিভুবন প্যাটেল শোষিত খামারীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং পাশে পেয়েছিলেন ড. কুরিয়ানকে। প্রাথমিকভাবে দুধ ও অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য বিন্যাস ছাড়াই সমবায় নেটওয়ার্ক তৈরী করেছিলেন এবং প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সমবায় মাত্র ২৪৭ লিটার দুধ দিয়ে সমিতির যাত্রা শুরু করেছিল।

৩। ড. ভার্গিস কুরিয়েন ও আমূল:

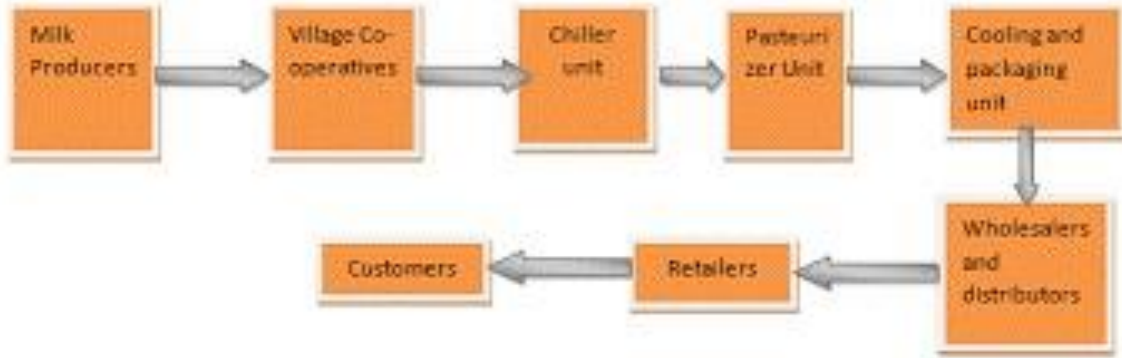
ড. কুরিয়েন মি: প্যাটেলকে সাথে নিয়ে যে সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন সেখানে সমবায়ীদের ভূমিকা ছিল খামারীদের কাছে থেকে দুধ সংগ্রহ করা এবং দুধের গুণমান অনুযায়ী তাদের যথাযথ মূল্য প্রদান করা। ড. কুরিয়েন কয়রা জেলা সমবায় দুগ্ধ উৎপাদনকারী ইউনিয়ন লিমিটেডকে একটি অনন্য নাম দিতে চেয়েছিলেন যা সহজেই উচ্চারণ করা যায় এবং এটি ইউনিয়ন বৃদ্ধিতেও সহায়তা করতে পারে। বিভিন্ন কর্মচারী ও খামারীদের নিকট থেকে পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল। জনৈক কোয়ালিটি কন্ট্রোল তত্ত্বাবধায়ক ‘আমূল’ নামটি সুপারিশ করেছিলেন, যা সংস্কৃত শব্দ এবং এর অর্থ অমূল্য এবং এটি অপরিবর্তনীয় শ্রেষ্ঠত্বকে বুঝায়। পাশাপাশি আনন্দ মিল্ক ইউনিয়ন লিমিটেড সংক্ষেপে আমূল হিসেবে মেনে নেয়া হয়।

দুধ উৎপাদনে ভারতের উত্থান এবং বাংলাদেশের অভিযাত্রা (দ্বিতীয় পর্ব)

প্রকাশ: ১১:০১ এএম, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২২

সমবায় মডেল পরিচালনা:

এক পর্যায়ে বহু সমবায় সমিতি গঠন করল আমূল। এই সমবায় সমিতিগুলির দিনে দুইবার গ্রামের খামারীদের নিকট থেকে দুধ সংগ্রহ করছিল। দুধে ফ্যাটযুক্ত পরিমাণ অনুসারে খামারীদের মূল্য প্রদান করা হচ্ছিল। এজন্য ফ্যাট মাপার যন্ত্র, প্রাথমিক পরীক্ষা, খামারীদের সচেতন করা ইত্যাদি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। একই দিনে দুধভর্তি সকল ক্যান দুধ চিলার ইউনিটে স্থানান্তর করা হচ্ছিল এবং সেখানে কয়েক ঘণ্টার জন্য স্টোরেজ করে, অতঃপর পাস্তুরাইজেশন, কুলিং ও প্যাকেজিং ইউনিটে নেয়া হচ্ছিল। সেখান থেকে প্রথমে পাইকারী সরবরাহকারী এবং পরবর্তীতে খুচরা বিক্রেতাদের এবং এই দুই স্তরের বিপণন চ্যানেল অনুসরণ করে ভোক্তা গ্রাহকদের নিকট দুধ পৌঁছে যেত। এই সাপ্লাই চ্যানেলটি ড. কুরিয়েন এবং মি: ত্রিভূবনদাস প্যাটেল ডিজাইন করেছিলেন। এর ফলশ্রুতিতে সমবায় ব্যবস্থার উন্নতি অব্যাহত ছিল এবং ১৯৬০ এর শেষের দিকে আমূল গুজরাটে সাফল্যের গল্পে পরিণত হয়েছিল।



৪। অপারেশন ফ্লাড: ভারতীয় শ্বেত বিপ্লব:

১৯৬৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল আমূলের আওতায় দুগ্ধবতী গাভীর ফিডিং পদ্ধতির নতুন প্রযুক্তি উদ্বোধনের জন্য। দিন শেষে তার ফিরে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আনন্দে পৌঁছে সমবায়ী খামারীদের সাফল্য জানার জন্য থেকে গিয়েছিলেন এবং ড. কুরিয়েনের সাথে সকল সমবায় পরিদর্শন করেছিলেন। আমূলের খামারীদের

সাথে দুধের আদ্যপান্ত নিয়ে করা শূটিং দেখে এবং খামারীদের সাথে মতবিনিময় করে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিতে ড. কুরিয়েনের ভূমিকা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। দিল্লীতে ফিরে লালবাহাদুর শাস্ত্রী ড. কুরিয়েনকে তার ডেইরী মডেল বা আনন্দ প্যাটার্নটি সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে বলেন। সম্মিলিত চেম্বার ফলস্বরূপ ১৯৬৫ সালে গুজরাটে ভারতের জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড (এনডিডিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ড. কুরিয়েন এনডিডিবির দায়িত্ব নেন এবং আনন্দ প্যাটার্ন ভারতে অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন এবং এই সম্প্রসারণের ফলে সারাদেশে দুধের সরবরাহ দ্রুত বাড়ছিল। আজ ভারত পাশের দেশ শ্রীলংকার মতই দুধের সবচেয়ে বড় আমদানীকারক দেশে পরিণত হতে পারত, যদি সেই সময় ভারত সরকার এনডিডিবি প্রতিষ্ঠা না করত এবং পর্যাপ্ত পদক্ষেপ না নিত। প্রতিষ্ঠা লগ্নে এনডিডিবি সবচেয়ে বড় সমস্যায় পড়েছিল দুধের বিপ্লব ঘটাতে অর্থ সংস্থান নিয়ে। এই অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য এনডিডিবি বিনা শর্তে অনুদান প্রদানের জন্য বিশ্বব্যাংক অনুরোধ করার চেষ্টা করেছিল। ১৯৬৯ সালে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ভারতে আসেন। ড. কুরিয়েন তাকে বলেছিলেন “আমাকে টাকা দিন এবং ভুলে যান”। কিছুদিন পর বিশ্বব্যাংক এনডিডিবিতে ঋণ অনুমোদন দেয়। এই সহায়তা একটি অপারেশনের অংশ ছিল, যা পরবর্তীতে ‘অপারেশন ফ্লাড’ নামে পরিচিতি পায়। এই অর্থ দিয়েই আনন্দ প্যাটার্ন সম্প্রসারণ করা হয় এবং ভারতজুড়ে প্রায় এক লক্ষ সমবায় ৫০ লক্ষ খামারীকে প্রোডিউসার গ্রুপভুক্ত করে সমবায়ে যুক্ত করা হয়েছিল। একই সাথে গুডো দুধ তৈরী, দুগ্ধপণ্য বহুমূখীকরণ, পশুপুষ্টি, পশুস্বাস্থ্য এবং রোগ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছিল। ১৯৭৩ সালে গুজরাট সমবায় দুধ বিপণন ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা পায়। ভারতের পাশাপাশি বিদেশেও আমূল পণ্য ব্রান্ড হিসেবে বিক্রি করার জন্য আমূলের অধিনে একটি পৃথক বিপণন ইউনিট সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, আমূল বর্তমানে দেড়কোটি ডেইরী খামারীকে সারাদেশে প্রায় ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ২৪৬টি দুগ্ধ সমবায় সমিতি কার্যকর হয়েছে এবং ভারত আজ বিশ্বে বৃহত্তম দুধ উৎপাদনকারী দেশের মর্যাদায় আসীন হয়েছে। অপারেশন ফ্লাডের মূল ভিত্তি ছিল (ক) সমবায় ইউনিয়ন গঠনের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা, ইনপুট ও পরিষেবা সরবরাহের দ্বারা দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি বা দুধের বন্যা; (খ) গ্রামীণ খামারীর আয় বৃদ্ধি এবং (গ) দুধের গ্রাহক বা ভোক্তাদের জন্য যুক্তিসংগত মূল্য। অপারেশন ফ্লাড তিনটি দফায় কার্যকর করা হয়েছিলঃ

(ক) **প্রথম পর্যায়:** ১৯৭০-১৯৮০ সাল এই দশকে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে তৎকালীন ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে পাওয়া গুড়ো দুধ ও মাখনের তেল বিক্রি করে এনডিডিবি কে বা দেশের ডেইরী সেক্টরকে অর্থায়ন করা হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে অপারেশন ফ্লাড ভারতের ৪টি প্রধান মহানগরী দিল্লী, মুম্বাই, কলিকাতা ও চেন্নাইয়ের গ্রাহকদের সাথে ভারতের ১৮টি মিল্ক হাবকে যুক্ত করা হয়েছিল।

(খ) **দ্বিতীয় পর্যায়:** ১৯৮১-১৯৮৫ মেয়াদে মিল্ক হাব ১৮ থেকে ১৩৬টিতে উন্নীত করা হয়েছিল এবং ২৯০টি নগরীর বাজারে দুধের আউটলেট স্থাপন করা হয়েছিল। এসময়ে একই সাথে গুড়োদুধের উৎপাদন বছরে ২২ হাজার টন থেকে ১৯৮৮ সালে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার টন হয়েছিল এবং এই উন্নয়নের পিছনে বিশ্বব্যাংকের ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিনিয়োগ ছিল চোখে পড়ার মত।

(গ) **তৃতীয় পর্যায়:** ১৯৮৫-১৯৯৬ মেয়াদে দুগ্ধ সমবায়গুলির ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বাজারজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও জোরদারে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সমবায়ের সদস্যদের শিক্ষার পাশাপাশি সহযোগী সদস্যদের ভেটেরিনারি ও প্রাথমিক চিকিৎসা স্বাস্থ্য পরিষেবা, পশুখাদ্য, কৃত্রিম প্রজনন ইত্যাদি বিষয়ে জাগরণ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই সময়ে মহিলাদের জন্য পৃথক সমবায় উদ্যোগকে সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। আরও গুরুত্ব দেয়া শুরু হয়েছিল স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে এবং প্রোটিন ফিড ও ইউরিয়া মোলসেস ব্লক এবং বাইপাস প্রোটিন নিয়ে ব্যাপক ভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম। ফলে অবদানও রেখেছিল অনেক।

৫। আনন্দ প্যাটার্ন:

সমবায় প্রচেষ্টার মাধ্যমে খামারীদের বেশী লাভ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মিল্ক হাইজিন/ফার্ম হাইজিন বৃদ্ধিই হলো আনন্দ প্যাটার্নের বৈশিষ্ট্য। আনন্দ প্যাটার্ন আসলে পেশাদার পরিচালনার মাধ্যমে সমবায় ভিত্তিতে দুধ সংগ্রহ, পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদিকেই উৎসাহিত করে। আনন্দ প্যাটার্ন সফল হয়েছিল কারণ ইহা খামারীদের সমবায় খামারীদের নির্বাচিত খামারী কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং নির্বাচিতগণ সকল খামারীর নিকট দায়বদ্ধ থাকে। এক্ষেত্রে গ্রাম সমবায়, দুধ ও গবাদিপশু, জেলা ও রাজ্য সমবায় এবং জাতীয় বিপণন সকল

ক্ষেত্রে খামারীদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত ও তাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। আনন্দ প্যাটার্ন সমবায়কে ভোক্তার সাথে সংযুক্ত করে। আনন্দ প্যাটার্নের ৩টি স্তর। যথাঃ

(ক) গ্রাম সোসাইটি: আনন্দ প্যাটার্ন গ্রামের দুগ্ধ সমবায় সমিতির (ডিসিএস) মাধ্যমে দুধ উৎপাদনকারী খামারীদের সংগঠিত করে। যেকোন খামারী ১টি শেয়ার কিনে কিংবা সেখানে দুধ বিক্রি করে সমিতির সদস্য হতে পারে। প্রতিটি ডিসিএস এর জন্য ১টি দুধ সংগ্রহ কেন্দ্র থাকে যেখানে খামারীগণ প্রতিদিন দুধ প্রদান করেন, মিল্ক ফ্যাট ও সলিড নট ফ্যাট/এসএনএফের ভিত্তিতে দুধের মান ও দাম নির্ধারিত হয়। প্রতিবছর শেষে ডিসিএসের লাভের ১টি অংশ খামারীদের সারা বছর দেয়া দুধের পরিমানের উপর ভিত্তি করে পৃষ্ঠপোষকতা বোনাস প্রদান করা হয়।

(খ) জেলা ইউনিয়ন: একটি জেলা সমবায় দুধ উৎপাদনকারী ইউনিয়ন, দুগ্ধ সমবায় সমিতিগুলির মালিকানাধীন। এই জেলা ইউনিয়ন সমস্ত সমিতির দুধ কিনে নেয় এবং প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাত করে। বেশীরভাগ জেলা ইউনিয়ন ডিসিএসগুলির সদস্যদের জন্য বিভিন্ন ধরণের ইনপুট এবং পরিষেবা সরবরাহ করে।

(গ) রাজ্য ফেডারেশন: একটি রাজ্যের বা প্রদেশের সকল জেলা ইউনিয়ন একটি রাজ্য ফেডারেশন গঠন করে। এই রাজ্য ফেডারেশন ইউনিয়নগুলোর তরল দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য বিপণনের জন্য দায়ী থাকে। কিছু কিছু রাজ্য ফেডারেশন পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং ইউনিয়ন কার্যক্রমকে সহায়তা করে থাকে।

দুধ উৎপাদনে ভারতের উত্থান এবং বাংলাদেশের অভিযাত্রা (তৃতীয় পর্ব)

প্রকাশ: ১১:০২ এএম, ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২২

৬। পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা:

ভারতের দুগ্ধখাতকে একটি প্রাণবন্ত ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপে রূপান্তরিত করার জন্য অপারেশন ফ্লাড সেদেশে একটি শক্তিশালী ভিত্তি রচিত করেছিল। দুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বনেতৃত্ব দেয়ার জন্য ভারতের পথকে প্রশস্ত করেছিল অপারেশন ফ্লাড। অতঃপর ভারতের ডেইরী শিল্পের জন্য

চ্যালেঞ্জ ছিল অপারেশন ফ্লাডের অঅওতায় তৈরী নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে একে আরও শক্তিশারী করা। ভারতের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ডেইরী সেক্টরকে দুগ্ধ সমবায় আন্দোলনের সর্বোচ্চ সম্ভাবনায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ৪টি মূল ক্ষেত্রে নজর নিবন্ধ করে, যথাঃ সমবায় ব্যবসা জোরদার করা; উৎপাদন বৃদ্ধি করা, গুণমান নিশ্চিত করা এবং একটি জাতীয় নেটওয়ার্ক তৈরী করা। এনডিডিবি দেশের সকল খামারীর উপকারের দিকে লক্ষ্য করে প্রেক্ষিত পরিকল্পনাটি সহজ করেছিল এবং উহা বাস্তবায়নের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা ও প্রয়োজন ভিত্তিক অর্থ সরবরাহ করেছিল।

৭। ন্যাশনাল ডেইরী প্লান-১ (এনডিপি-১)

জাতীয় দুগ্ধ পরিকল্পনা-১ বা প্রথম পর্ব ২০১১-২০১২ থেকে ২০১৮-১৯ মেয়াদের জন্য ভারতের একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) ঋণ হিসেবে ১৫ হাজার ৮৪৪ কোটি রুপি; ভারত সরকার ১৬৬ কোটি রুপিসহ মোট ২২৪২ কোটি রুপি বিনিয়োগ করার মাধ্যমে এনডিপি-১ বাস্তবায়ন হয়েছে। ভারতের ১৮টি বড় দুধ উৎপাদনকারী রাজ্য যথাঃ অন্ধ্র প্রদেশ, বিহার, গুজরাট, হরিয়ানা, কর্ণাটক, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, তেলেংগানা, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবংগ, উত্তরাখন্ড, ঝাড়খন্ড এবং ছত্রিশগড়ে ; অর্থাৎ যে রাজ্যগুলো গড়ে ভারতের ৯০% দুধ উৎপাদন করে, এমন রাজ্যগুলোকে এনডিপি-১ এর আওতায় বিনিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৮। ডেইরী প্রোসেসিং ও অবকাঠামো উন্নয়ন তহবিলঃ

ভারতে ডেইরী শিল্পের বেশীরভাগ প্রতিষ্ঠান অপারেশন ফ্লাডের সময় অর্থাৎ ১৯৯৬ সাল বা তার পূর্বে প্রতিষ্ঠা করা। ইতোমধ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ২০১৭ সালে ভারত সরকার ১০ হাজার ৮৮১ কোটি রুপির ডেইরী প্রোসেসিং ও অবকাঠামো উন্নয়ন ফান্ড গঠন করে ২০১৭-১৮ থেকে ২০১৯-২০ মেয়াদের জন্য। অতঃপর ২০২০ সালে ভারতের কেবিনেট কমিটি ফর ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স এই মেয়াদ ২০২২-২৩ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে।

৯। ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর ডেইরী ডেভেলপমেন্ট:

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৩০০ কোটি রুপির কেন্দ্রীয় ফীম চালু করেছে ডেইরী সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে বিনিয়োগ প্রদানের জন্য। এরূপ বাজেটের আওতায় সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক শুধুমাত্র উত্তর প্রদেশ ও বিহার রাজ্যের জন্য ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ মেয়াদে ভারত সরকার ও জাইকার সহায়তায় ১৫৬৮.২৮ কোটি রুপির 'ডেইরীং থ্রো কোঅপারেটিভস- কি টু সাসটেইনেবল লাইভলুহুড' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

ভারতে ডেইরী উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ ও তৎপরতা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে প্রকৃতিগতভাবেই ভালো মানের মহিষের জাত যেমনঃ মুরাহ; নিলি-রাভি; মেহসানা; জাফরাবাদি, বান্নী এবং গাভীর ক্ষেত্রে বিখ্যাত গীর; রথী, লাল সিন্ধী, শাহীওয়াল, শেওতাকাপিলা ইত্যাদি মানসম্মত উচ্চ উৎপাদনশীল জাত ভারতকে শক্তিশালী অবস্থানে যেতে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে।

খ) বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ খাতের ক্রমবিকাশ:

লেফটেন্যান্ট উইলিয়াম ফ্রিজার ও লন্ডন কোর্ট অফ ডিরেক্টরের উদ্যোগে ১৭৭৫ সালে বৃটিশ সামরিক অশ্বারোহী বাহিনীতে ঘোড়া সরবরাহের উদ্দেশ্যে ভারতে পোষা ঘোড়ার খামার স্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই এতদঞ্চলে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রাণিসম্পদ সেবার শুরু। এরও প্রায় শতাধিক বছর পরে ১৮৯৩ সালে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ সিভিল ভেটেরিনারি ডিপার্টমেন্ট যাত্রা শুরু করে।

পাক ভারত স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত প্রাণিসম্পদের উৎপাদন সম্পর্কিত 'পশুপালন বিভাগ' কৃষি অধিদপ্তরের সাথে সম্পৃক্ত থেকে পরিচালিত হতো। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পরে উক্ত পশুপালন বিভাগের সদর দপ্তর কুমিল্লা জেলা শহরের ক্ষেত্রী বিল্ডিং এ স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ৩১ অক্টোবর ১৯৪৮ ইং তারিখে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক পশুপালন বিভাগকে নতুনভাবে পুনর্গঠিত করে বেসামরিক ভেটেরিনারি সার্ভিস অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পুনর্গঠিত পশুপালন বিভাগের নামকরণ করা হয় Directorate of Animal Husbandry.

১৯৬০ সালে পশুপালন বিভাগ আবার পুনর্গঠিত করে এর সদর দপ্তর কুমিল্লা থেকে ঢাকার নিমতলীস্থ 'সাইন্স ভিলা'-তে স্থানান্তর করা হয়। এ সময় পশুপালন বিভাগের অবকাঠামোগত সংস্কার ও পেশাগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি ও ভেটেরিনারি সার্ভিসের মান উন্নয়ন এবং লোকবল বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যাপারে সার্বিকভাবে পরিবর্তন আনা হয়। এই পুনর্গঠনের ফলে পশুপালন বিভাগের নতুন নামকরণ হয় Directorate of Livestock Services. এ সময়ে নবগঠিত পশুপালন অধিদপ্তরের বিভাগীয় পর্যায়ে থেকে শুরু করে থানা পর্যন্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিভাগীয় ও সমপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ১ম শ্রেণীর গেজেটেড পদমর্যাদাসহ পূর্ব পাকিস্তান হায়ার লাইভস্টক সার্ভিসেস (EPHLS) অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্য দিকে জেলা ও সমপর্যায়ে কর্মকর্তাগণ ২য় শ্রেণীর পদমর্যাদায় পূর্ব পাকিস্তান এ্যানিমেল হাজবেল্ট্রী সার্ভিসের (EPAHS) অন্তর্ভুক্ত ছিল। পশুপালন অধিদপ্তরের পূর্ণবিন্যাসের ফলে থানাতে ০২ জন কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করা হয়। ০১ জন থানা সহকারী পশুপালন কর্মকর্তা, যার মূল কাজ ছিল পশুপাখির সার্বিক উন্নয়ন এবং অন্যজন থানা সহকারী ভেটেরিনারি সার্জন, যিনি পশুপাখির চিকিৎসা ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের দায়িত্বে থাকতেন। পরবর্তীকালে ১৯৬৪ সালে সদর দপ্তর ঢাকার নিমতলীস্থ 'সাইন্স ভিলা' হতে সচিবালয়ের অভ্যন্তরে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬৬ সালের জুন মাসের পূর্বে শুধুমাত্র মহকুমা তদুর্ধ্ব পদগুলোতে সংক্ষিপ্ত ০৩ মাসের পিজিটি সমাপ্তির উপর পদোন্নতি প্রাপ্ত ডিপ্লোমাধারী এবং ডিগ্রীধারী কর্মকর্তাদের নিয়োগের বিধান চালু করা হয়, যে সার্ভিসে পশুপালন ও পশু চিকিৎসা উভয় ডিসিপ্লিনের গ্রাজুয়েটগণ কর্মরত থাকতেন। এই সময়ে মহকুমা ও থানা পর্যায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ সাব অর্ডিনেট লাইভস্টক সার্ভিসের (আপার) অন্তর্গত ছিল। অন্যদিকে ডিপ্লোমাধারী কর্মকর্তাগণ পূর্বের ন্যায় নিম্নতর এ্যানিমেল হাজবেল্ট্রী সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত থাকে। ১৯৬৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে মহকুমা ও থানা পর্যায়ে নিয়োজিত সকল ডিগ্রীধারী কর্মকর্তাদের পদ ২য় শ্রেণীর গেজেটেড পদ মর্যাদায় উন্নীত করা হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে সদর দপ্তরটি পুনরায় ১০৫/১০৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় এবং তৎপরবর্তীতে আলাউদ্দিন রোডে স্থানান্তরিত হয়। পরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে মহকুমা ও থানা পর্যায় পর্যন্ত নিয়োজিত ডিগ্রীধারী কর্মকর্তাদের পদ ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই থেকে ১ম শ্রেণীর মর্যাদায় উন্নীত করা হয়। ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বছরে সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক সংস্কার সাধন করা হয়। এতে মহকুমাগুলিকে জেলায় রূপান্তর

করা হয়। থানাগুলিকে জন প্রতিনিধির (চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ) অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ফলশ্রুতিতে অন্যান্য বিভাগের মত তৎকালীন পশুপালন বিভাগের থানা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপজেলা পরিষদে প্রেষণে নিয়োজিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার কমিটির (এনাম কমিটি) রিপোর্টের ভিত্তিতে পশুপালন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস করা হয় এবং এর ফলে (ক) অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন), (খ) অতিরিক্ত পরিচালক (সম্প্রসারণ), (গ) অতিরিক্ত পরিচালক (উৎপাদন), (ঘ) অতিরিক্ত পরিচালক (গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন) পদ সৃষ্টি হয়। এই সময়ে সদর দপ্তরটি সর্বশেষ ১৯৮৪ সালে ফার্মগেটে অবস্থিত কৃষি খামার সড়কে অধিদপ্তরের জন্য নবনির্মিত নিজস্ব ভবনে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে পশুপালন অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে পশুসম্পদ অধিদপ্তর করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯২-৯৩ সালে জনাব মান্নান কমিটির সুপারিশে পরিচালক পদটি মহাপরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালকের পদগুলো পরিচালক পদে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৯৫ সালে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের পদ উন্নীত করাসহ পরস্পর বদলীযোগ্য ১৯১টি জেলা ও সমপর্যায় ও পরবর্তীতে ৪৭টি উপ-পরিচালক ও সমপর্যায়ের পদ হতে ১৩টি পদকে উচ্চতর বেতন স্কেলে উন্নীত করা হয়। এভাবে কালের পরিক্রমায় ২০১১ সালে পশুসম্পদ অধিদপ্তর 'প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর' নামে নবযাত্রা শুরু করে। অতঃপর সুদীর্ঘ প্রয়াস ও নিরলস পরিশ্রমের ফলস্বরূপ ২০২১ সালে সর্বশেষ জনবলকাঠামো পায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। এই জনবল কাঠামোয় পরিচালক পদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সকল প্রশাসনিক বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের অধিকর্তাগণ পরিচালক (৩য় গ্রেড) পদে উন্নীত হোন এবং একই সাথে ৫ম গ্রেড পদসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়।

দুধ উৎপাদনে ভারতের উত্থান এবং বাংলাদেশের অভিযাত্রা (চতুর্থ পর্ব)

প্রকাশ: ১১:০০ এএম, ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২২

জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান

কৃষি প্রধান জনবহুল বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা, সুস্বাস্থ্য, বেকার সমস্যার সমাধান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কৃষি জমির উর্বরতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং স্মৃতিশক্তি

বিকশিত মেধা সম্পন্ন জাতি গঠনের জন্য অপরিহার্য খাত হলো প্রাণিসম্পদ খাত। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ছিল ১.৪৪ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩.৮০ শতাংশ। মোট কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান প্রায় ১৩.১০ ভাগ। তাছাড়া ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপির আকার ছিল ৫০৩০১ কোটি টাকা, (সূত্র: বিবিএস ২০২০-২১)। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান, অর্থাৎ প্রতি বছর প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপি বেড়েই চলছে।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প: বাংলাদেশে ডেইরী সেক্টরের উন্নয়ন স্বপ্ন বাস্তবায়নে সম্মিলিত প্রয়াস ও প্রতিশ্রুতি

প্রকল্প পরিচিতি:

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পটি অধিদপ্তর এবং মন্ত্রনালয়ের জন্য একটি ফ্লাগশিপ প্রকল্প যেখানে মোট বিনিয়োগ ৪২৮০ কোটি টাকারও বেশি। সদাশয় সরকার বিশ্বব্যাংক থেকে ৫০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা গ্রহণ করে, যা দেশের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়নে এযাবৎকালের সর্ববৃহৎ বিনিয়োগ। জানুয়ারী ২০১৯ সালে যাত্রা শুরু করে এক বছরের মাথায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কোভিড-১৯ গ্লোবাল প্যানডেমিকে ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হলেও বর্তমানে ঘুরে দাড়িয়েছে। ২০১৯-২০২৩ এই পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাণিসম্পদ তথা গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, পোল্ট্রির উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন ধরনের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি প্রদর্শনী দ্বারা খামারীদের দক্ষতা উন্নয়ন, দুধ বিপণনের জন্য বাজার সংযোগ, পণ্য বহুমুখীকরণ, মূল্য সংযোজন, স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রাণিজাত আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি ফুড চেইনের সকল পর্যায়ে সেফটি নিশ্চিতকরণ, দুধ-মাংস উৎপাদনকারী, পরিবহনকারী, ব্যবসায়ী, কারিগর, ভোক্তা ইত্যাদি সকল স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি, এতদসংক্রান্ত প্রোটোকল/নীতি প্রণয়ন ও অনুসরণ, বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে ম্যাচিং প্লান্ট পদ্ধতিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৪০০টি ভিলেজ মিল্ক কালেকশন সেন্টার, আঞ্চলিক পর্যায়ে ২০টি ডেইরী হাব স্থাপন, পশু জবাই ও মাংস প্রক্রিয়াকরণের জন্য মেট্রো পর্যায়ে ৩টি, জেলা পর্যায়ে ২০টি পশুজবাইখানা নির্মাণ, উপজেলা/গ্রোথ সেন্টার পর্যায়ে ১৯২টি স্লটার স্লাব/মাংসের বাজার

উন্নয়ন, খামারের বর্জ্য ব্যবহার করে বিকল্প জ্বালানী/বায়োগ্যাস ও বায়োফাটিলাইজার উৎপাদনে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক দেয় ভেটেরিনারী সেবা আরও বেগবান করা ও মানোন্নয়নের জন্য ডায়াগনোস্টিক ল্যাব ও ভেটেরিনারী হাসপাতালসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, উপজেলা পর্যায়ে মোবাইল ভেটেরিনারী ক্লিনিক ব্যবস্থা পরিচালনা, ভোক্তা সৃষ্টি ও পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পাইলট আকারে স্কুল মিল্ক কার্যক্রম পরিচালনা, প্রাণিসম্পদ বীমা ব্যবস্থায় উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ডাটাবেজ তথা ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তির সেবা প্রদান দক্ষতা বৃদ্ধি, ইত্যাদি কার্যক্রম রয়েছে প্রকল্পটিতে।

প্রকল্প এলাকায় প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সেবা খামারীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (৪২০০জন), উপজেলা পর্যায়ে লাইভস্টক ফিল্ড এসিস্টেন্ট (৯৩০জন) এবং প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (৪৬৫জন) প্রকল্প অর্থায়নে নিযুক্ত রয়েছে, প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে সিভিল ওয়ার্কস এর জন্য ৩জন সহকারি প্রকৌশলী এবং একটি ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম নিয়োজিত রয়েছে। প্রকল্প কার্যক্রম তদারকি ও তথ্য সংগ্রহের জন্য ২০জন মনিটরিং অফিসার ও সিনিয়র এমএন্ডই বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে প্রকল্পটির শক্তিশালী মনিটরিং সেল রয়েছে।

প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ সেবা প্রদানে ফার্মারস ফিল্ড স্কুল মডেল

প্রকল্পভূক্ত ৪৬৬ উপজেলায় ৪টি ভিন্ন ভিন্ন ভেলুচেইন বিশেষকরে (ক) ডেইরী ভেলুচেইন, (খ) বীফ ফ্যাটেনিং ভেলুচেইন, (গ) জাবরকাটা ছোট প্রাণি অর্থাৎ ছাগল/ভেড়া ভেলুচেইন এবং (ঘ) দেশী হাস-মুরগী ভেলুচেইনের আওতায় গড়ে ৩০জন খামারী সংগঠিত করে একটি প্রোডিউসার গ্রুপ বা পিজি গঠন করা হয়েছে/হচ্ছে। এরকম মোট পিজি হবে ৫৫০০টি। এই পিজিভিত্তিক ফার্মারস ফিল্ড স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং এই ফিল্ড স্কুল বা খামারীর উঠান বা খামারকেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, প্রযুক্তি হস্তান্তর, উপকরণ সরবরাহ, পুষ্টি য স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি যাবতীয় সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গবাদিপশুর উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি, খামারের হাইজিন উন্নয়ন ও ফুড সেফটি উন্নয়ন করা হবে। অর্থাৎ প্রশিক্ষণ বা সম্প্রসারণ সেবার জন্য খামারীকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে নয়, বরং প্রাণিসম্পদ দপ্তর এই পিজি ভিত্তিক ফার্মারস ফিল্ড পরিচালনার মাধ্যমে খামারী তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা বাড়িতে বসেই পেয়ে যাবেন।

দুধ উৎপাদনে ভারতের উত্থান এবং বাংলাদেশের অভিযাত্রা (পঞ্চম ও শেষ পর্ব)

প্রকাশ: ১১:০০ এএম, ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০২২

প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণে মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক ব্যবস্থার প্রচলন:

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ সেক্টরে বিশেষকরে রুমিনেন্ট প্রাণি যেমন দুধের গাভী, মহিষ, মাংসের গরু, ছাগল ভেড়া ইত্যাদি লালন পালনে এখনও স্মলহোল্ডারদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। অর্থাৎ এখনও গ্রাম ও উপশহর এলাকায় প্রায় হাউজহোল্ডে গবাদিপশু লালন পালন করা হয়। প্রাণিস্বাস্থ্য সেবার জন্য খামারীগণ আত্মনির্ভরশীল নয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর তার সীমিত জনবল ও দেশের প্রাইভেট সেক্টরে কর্মরত সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের মাধ্যমে এই স্বাস্থ্যসেবা চালিয়ে নেয়ার প্রয়াস পাচ্ছে। দেশে এখনও অনেক পরিবার আছে একটি গাভীই তাদের জীবিকার অবলম্বন। সময়যোচিত চিকিৎসাসেবা না পাওয়ায় হয়তো সে আংশিক বা পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এই সমস্যা উত্তোরণের জন্য সদাশয় সরকার প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের ন্যায় চালু করতে যাচ্ছে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা সেবার জন্য মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক। এইটি শুধু উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার জন্য বাহনই নয় বরং ভ্রাম্যমাণ একটি ভেটেরিনারি ক্লিনিক যেখানে রয়েছে জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ ও যন্ত্রপাতি। এমনকি শল্য চিকিৎসা সরঞ্জাম থাকবে এ বাহনে। পোর্টেবল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি মেশিন, ম্যাস্টাইটিস ডিটেক্টর, এস্ট্রাস ডিটেক্টর, সার্জিক্যাল কিটবক্স, ম্যানিপুলাটিভ ডেলিভেরী যন্ত্রপাতি, পোস্টমর্টেম সেট, স্টোমাক টিউব, এনিমেল রেস্ট্রইনিং আইটেম, গামবুট, অ্যাপ্রোণ, স্যালাইন স্ট্যান্ড ইত্যাদি সুবিধা থাকবে এই মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকে। ফলে অসুস্থ পশুকে হাসপাতালে এনে নয় বরং অসুস্থ পশুর কাছেই চলে যাবে কাংখিত স্বাস্থ্যসেবা। প্রাণিসম্পদ খাতে হবে নবযুগের সুচনা, ভেটেরিনারি সেবা যাবে খামারী দোর গোড়ায়।

ডেইরী উন্নয়নে ডেইরী হাব মডেল:

দেশে আবহমান কাল থেকেই ডেইরী সেক্টর উন্নয়নে ডেইরী কো-অপেরাটিভস মডেল কাজ করে আসছে। প্রযুক্তি ও সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উন্নয়ন মডেলেও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। সমবায়

মডেলের সাথে আরও বাড়তি সুবিধাদি যুক্ত করে ডেইরী উন্নয়নে ডেইরী হাব মডেল আজ অধিক গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর। প্রান্তিক পর্যায়ে সংগঠিত পিজিসমূহে নিবিড় সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পণ্যের মানোন্নয়নের মাধ্যমে এইসব পণ্য স্থানীয়ভাবে স্থাপিত ভিলেজ মিল্ক কালেশন সেন্টার বা ভিএমসিসির সাথে যুক্ত করা হবে। যে গ্রামে বা পিজিসমূহে দুধের উৎপাদন বেশী তার নিকটবর্তী যোগাযোগ ভালো এমন পয়েন্টে সরকার প্রদত্ত ম্যাচিং গ্রান্ট পদ্ধতির আওতায় উদ্যোক্তা ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এসব ভিএমসিসি স্থাপিত ও পরিচালিত হবে। অর্থাৎ এই ভিএমসিসির মাধ্যমে দুধ ক্রয় করা হবে, এবং এরূপ গড়ে ২০টি ভিএমসিসির দুধ একটি আঞ্চলিক ডেইরী হাবে এনে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে প্রক্রিয়াকরণ বা পণ্য বহুমুখীকরণের জন্য প্রসেসিং প্লান্ট বা ফ্যাকটরীতে যাবে। সরকার ২০টি ডেইরী হাবের আওতায় মোট ৪০০টি ভিএমসিসি স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী সংগঠিত ডেইরী পিজিসমূহকে তাদের উৎপাদিত দুধ বিপণনে সহায়তা করতে যাচ্ছে।

ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা জন্য শক্তিশালী ডাটাবেজ তৈরী:

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে চাই গ্রহণযোগ্য ডাটাবেজ। একদিনে এই ডাটাবেজ রচিত হয়না এবং এই ডাটাবেজ সৃষ্টির জন্য চাই প্রান্তিক পর্যায় বা খামারীর নিকট থেকে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও পরিসংখ্যানে রূপান্তর করা। আর তার জন্য চাই সঠিক সিস্টেম চালুকরণ। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার দেশের প্রকল্প এলাকার সকল খামার, খামারী, ও খামারের পশু ও তৎসম্পৃক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ, আইনী ভিত্তি তৈরী, খামার রেজিস্ট্রেশন ও পশু সনাক্তকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আশাকরা যায়, আগামী কয়েক বছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর খামার, খামারী ও পশুর বিস্তারিত ডাটাবেজ তৈরীর ভিত্তি রচিত করবে। এসব ডাটাবেজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, গবেষণা, ব্যবসা পরিকল্পনা, ইনসুরেন্স ইত্যাদি বহুবিধ সুবিধার ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে।

অন্যান্য আশু করণীয় বিষয়াদি:

প্রাণিসম্পদ খাতে যুগোপযোগী পরিবর্তন আনয়নের জন্য বাধ্যতামূলক খামার ও পশু নিবন্ধন, সকল খামার, খামারী ও পশুর ডাটাবেজ তৈরী ও তার আইনীভিত্তি রচনা, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও খামার

যান্ত্রিকীকরণ, বিশেষকরে উৎপাদন খরচ কমাতে পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিপণন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনয়ন, পশুরোগ প্রতিরোধ শতভাগ গবাদিপশুকে গুরুত্বপূর্ণ সকল রোগ প্রতিরোধে টীকা উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন, টীকা প্রদান কার্যক্রম জোরদারকরণ, প্রাণিসম্পদ খাত প্রাইভেট সেক্টর পরিবেষ্টিত একটি খাত তাই পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ উন্নয়ন ও তৎপরিচালিত প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি, ভেটেরিনারি ড্রাগের অপয়োজনীয় ব্যবহাররোধে এন্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, সবোপরি জাত উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমকে সুনির্দিষ্ট রেকর্ডকিপিং এর আওতায় এনে সত্যিকার উন্নয়নকে এগিয়ে নেয়া যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

<https://www.banglainsider.com/>